দ্রৌপদীর থান

এই সেদিনও দুটো ধানখেতের মধ্যে দিয়ে রাস্তা ছিল। দু'পাশে আদিগন্ত সবুজ ধানখেত দেখে মতিয়ুরের চোখে ঘোর লেগে যেত। মনে হত এটাই যেন পুরো ভূপৃষ্ঠ। হঠাৎ কখনও বউয়ের জন্য মন কেমন করায় শিয়ালদা থেকে শেষ ট্রেনে যেদিন আসত, সেদিন ভরা জ্যোৎস্না থাকলে বিপুল এই ধানখেতের বাইরে পৃথিবী বলে আরও কিছু আছে, বিশ্বাস হত না। কখনও কখনও লীনার একমাথা ঘন চুলের মধ্যে সিঁথির মতো ধানখেত চিরে চলে যাওয়া সরু পথে সে হাঁটতে ভুলে যেত। তন্ময় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকত বেশ কিছুক্ষণ।

ধানখেতের অনেকটাই এখন আর সেই খেত নেই। তার জায়গায় এলোমেলো ঘর-বাড়ি, মনোহারী দোকান, স্যাঁকরা শাড়ি চায়ের দোকান, দরমার সেলুন, দিশি মদের ঠেক। হঠাৎ এসে সাড়ে ন-বছর আগের সেই রোমাঞ্চকর রাস্তা ঠাহর করা সহজ নয়। এদিকে আবার কাউকে শ্বশুরবাড়ির রাস্তা জিজ্ঞেস করাও যাবে না। গত শতাব্দীতে মতিয়ুরের শ্বশুরবাড়ির গ্রাম ও আশপাশের অনেক গ্রাম মাঝেমাঝেই ম্যালেরিয়ায় উজাড় হয়ে যেত। তখনকার প্রচলিত অনেক গল্পের একটা ছিল এইরকম: গ্রামের এক জামাই অনেকদিন পর বউকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসে শ্বশুরবাড়ির রাস্তা আর খুঁজে পায় না। যাকেই জিজ্ঞেস করে সে মুখে কিছু বলে না, প্রশ্নকর্তার দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখেও না, শুধু হাত তুলে আঙুল দিয়ে একটা দিক দেখিয়ে দেয়। এ গল্পেরও অনেক শাখাপ্রশাখা। তার একটা এই যে, বউ জামাইকে ভাত বেড়ে দিয়ে সামনে বসেই হাত বাড়িয়ে বাড়ির পিছনের গাছ থেকে লেবু পেড়ে এনে দিচ্ছে দেখে জামাইয়ের জ্ঞান হারাবার দশা। কোনওরকমে রেলস্টেশনে ফিরে জানতে পারে, শ্বশুরবাড়ির গ্রামে কেউ আর বেঁচে নেই। সেই থেকে এখানে শ্বশুরবাড়ির রাস্তা জিজ্ঞেস না করাই রেওয়াজ। ভয়ে হোক, অভ্যাসেই হোক, এ নিয়ম আজও চলছে।

নিজের বুদ্ধি, স্মৃতি আর চিন্তাশক্তিতে ভর করে অনেকটা আন্দাজে মতিয়ুর মউঝুরি গ্রামে লীনাদের বাড়ি যখন পৌঁছল, তখন সন্ধেও আর খুব একটা তরুণ নেই। বাড়ি অন্ধকার। দরজা জানলার ফাঁক দিয়ে একটুও আলো আসছে না। বাড়ির পিছনের লেবুঝোপে শুধু কয়েকটা জোনাকি কাছাকাছির মধ্যে উড়ছে।

অন্ধকার বাড়ির সামনে কতক্ষণ আর দাঁড়িয়ে থাকা যায়! সে গলা তুলে ইচ্ছে করেই আগের অভ্যেস মতো লীনার নাম ধরে হাঁক পাড়তে লাগল।

বেশ কয়েকবার ডাকাডাকির পর বাতাবিগাছটার প্রায় লাগোয়া দরজা খুলে গেল।

জোর করে কোমর চাগিয়ে যথাসাধ্য সোজা হয়ে একজন অকালবৃদ্ধ হাতের হ্যারিকেন তুলে আগন্তুকের মুখ দেখতে লাগলেন। চিনতে পারলেন বলে মনে হল না। মতিয়ুর ভদ্রলোকের পায়ে দু'হাত ছুঁইয়ে কানে মাথায় হাত আলতো বুলিয়ে নিয়ে বলল, 'আমি মতিয়ুর। লীনার কাছে খুব দরকারে এসেছি। ও কি ঘরে নেই?'

'মতিয়ুর? তুমি মতিয়ুর? চোখে আর তেমন দেখি না বাবা! তা— কী মনে করে? অ্যাদ্দিন পরে! এসো, ভেতরে এসো।'

'লীনাকে দরকার।'

'আমাকে বলতে পারো না?'

'না, এটা ঠিক আপনার ব্যাপার না।'

'ব্যাপারটা কী?'

'আপনার কি চোখে ছানি পড়ল? দু-চোখেই, না এক চোখে?'

'দু-চোখেই।'

'কাটিয়ে নিলেই তো হয়। আজকাল ফেকো-টেকো কী করে, একদিনেই ছেড়ে দেয়।'

'এ-মাস না, ও-মাস, গ্রীষ্ম না শীত করতে করতেই বছরের পর বছর কেটে যায়। টাকা-পয়সারও টানাটানি।'

মতিয়ুর অজ্ঞাতে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'ভারি জেদী মেয়ে তো! অ্যালিমনি নিতেও আপত্তি। আসলে চেয়েছিল মেয়েকে, পেল না, তাই রাগ। আপনি তো দেখলাম কোমর সোজা করে দাঁড়াতেও পারছেন না। ও কি সেই টিউশনি করেই চালাচ্ছে?'

স্বরে ঝাঁকুনি দিয়ে 'না, না' বলে আরও কী বলতে গিয়ে ভদ্রলোক থেমে গেলেন।

'ফিরতে কি আজ দেরি হবে নাকি? আমাকে তো আবার ট্রেন ধরতে হবে।'

ভদ্রলোক কী ভেবে বললেন, 'তাহলে বাবা আজ ফিরেই যাও। কাল দিনের বেলা এসো।'

'কাল আমার সমস্যা আছে।'

মতিয়ুর আজই সই-সাবুদ সেরে নিতে চায়।

'নাতনি কত বড়টা হল?'

'এই তো ক্লাস নাইনে ভর্তি হবে।' একটু থেমে, 'লীনাকে কি একটা খবর দেওয়া যায়, যাতে তাড়াতাড়ি ফিরে আসে।'

বৃদ্ধকে চুপ করে থাকতে দেখে মতিয়ুর আবার বলল, 'কিংবা আমাকে ঠিকানা দিন, রাস্তাটা একটু বুঝিয়ে দিন, আমিই না হয় ওর সঙ্গে দেখা করে নেব।'

বৃদ্ধ এবারও বেশ খানিকক্ষণ নিরুত্তর থেকে বললেন, 'রোজ সন্ধেবেলা ও যুধিষ্ঠিরের মন্দিরে যায়। আরতি টারতি সেরে ফিরতে রাত হয়।'

'যুধিষ্ঠিরের মন্দির? আছে নাকি এদিকে? শুনিনি তো কখনও।'

'আছে, আছে। মহাভারতের অনেক কিছুই আজও আছে বাবা। জতুগৃহ আছে, পাশা খেলা আছে, বস্ত্রহরণ আছে, ঊরুভঙ্গ আছে, যুধিষ্ঠিরের ইতি গজ বলে যে প্রতারণা, তাও আছে।'

'ঠিক বুঝলাম না। আজ আমাকে উঠতেই হবে। না হলে ফেরার ট্রেন পাব না। কাল না হয় আসব একবার, যেভাবেই হোক সকাল-সকাল চলে আসব। একটু বলে রাখবেন।'

'তোমাকে যে চা-টা দেব, তার তো উপায়ই নেই।'

'তার দরকার নেই। আজ উঠি।'

মতিয়ুর উঠে বাতাবিগাছের তলা দিয়ে দরজার দিকে এগোতে যাচ্ছে, বৃদ্ধ হ্যারিকেন হাতে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'একটা বাতাবি পেড়ে নিয়ে যাও, বাবা।'

'আজ থাক।'

মতিয়ুরের পিছন পিছন এসে বৃদ্ধ বললেন, 'একটা কথা বলে যাও তো বাবা। তোমাদের দু'জনের বিচ্ছেদ হল কেন? কী এমন ঘটল? ধর্মে ধর্মে ধাক্কা তো নয়?'

'না, না। দু'জন মানুষের যৌথ জীবনে ধর্মের জায়গা আর কতটুকু! তাছাড়া লীনা তো প্রতি বছর বাড়িতে ওর পারিবারিক অভ্যেসে কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো করত। বকরি ঈদের সময় খাসির মাংস নিজের হাতে রেঁধে মুসলমান প্রতিবেশীদের বাড়ি বাড়ি পাঠাত।'

একটু থেমে মতিয়ুর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, 'ও আপনাকে কিছু বলেনি?'

'না তো।'

'দেখুন, দু'জন মানুষের মধ্যে অনেকটা ব্যবধান থাকাই স্বাভাবিক। জগতে কেউ কারো মতো নয়। যুগল জীবনে কে কতটা এই বিভেদ ব্যবধান কমিয়ে আনতে পারে সেটাই তো জীবনের পরীক্ষা। এখানে আমরা দু'জনই হেরে গেছি। আসলে যা জীবনে পাবার, পরস্পরের কাছে প্রত্যাশা তার চেয়ে বেশি হলে, সেই ফাঁক আর জোড়া লাগে না। অনুকূল হাওয়ায় উড়ন্ত ঘুড়িরও সুতো ছিঁড়ে যায়।' কথা শেষ করে মতিয়ুর আরও দুয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে দরজার বাইরে চলে গেল।

বাড়িতে তবু একটা হ্যারিকেন ছিল, বাইরে চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। তার মধ্য দিয়ে আসবার সময়ের পথ আন্দাজ করে মতিয়ুর খানিক এগিয়ে সম্পূর্ণ দিশাহারা। দোকান-এলাকাও আরও সামনের দিকে। অন্ধের মতো কিছুটা এগোবার পর পিছনে দূর থেকে সাইকেলের ঘণ্টি শুনে তাকাতেই দেখল টর্চের লম্বা একটা আলো এক-এক ঝলকে সামনের অনেকটা পথ দেখিয়ে আবার নিভে যাচ্ছে।

রাস্তা ছেড়ে মতিয়ুর একপাশে দাঁড়িয়ে পড়ল। মনে আশা, সাইকেলে স্টেশন পর্যন্ত লিফট দেওয়ার কথা বললে লোকটা হয়তো তাকে ক্যারিয়ারে তুলে নেবে।

কাছে এসে সাইকেল থেমে গেল। সিটে বসে থেকেই লম্বা একটা পা মাটিতে রেখে চব্বিশ-পঁচিশ বছরের একটা ছেলে বলল, 'এই ভূতনামানো অন্ধকারে যাচ্ছেন কোথায়?'

'রেলস্টেশন। কলকাতার ট্রেন ধরব।'

'নাম কী?'

'মতিয়ুর হাসান।'

'এদিকে এসেছিলেন কোথায়?'

'অলকেন্দু বিশ্বাসের বাড়ি।'

‘কী কাজ?’

‘ওনার মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে।’

‘দেখা হল?’

‘না। বললেন, ফিরতে রাত হবে।’

‘ও। মেয়ে কি বিধবা, না বিয়ের বয়েস পেরনো, না বিয়ে ভাঙা?’

‘কেন ভাই?’

‘এর একটাও সত্যি হলে, বাড়িতে বলেছে কি— যুধিষ্ঠিরের মন্দিরে গেছে?’

‘হ্যাঁ, তা-ই বলল। কিন্তু তুমি জানলে কী করে? তুমি কি ওদের ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী?’

‘এ-গ্রামের তিন গ্রাম দূরের গ্রামে থাকি আমি। তবে এখানকার দুয়েকটা গ্রামের অনেক বিধবা বা আইবুড়ো বা বিয়ে ভাঙা মেয়ে সন্ধেবেলা যুধিষ্ঠিরের মন্দিরে যাবার কথাই বলে।’

‘যুধিষ্ঠিরের মন্দির কি এখান থেকে অনেক দূর? একবার কি আমাকে নিয়ে যেতে পারো ভাই? একজনের সঙ্গে দেখা করেই স্টেশন চলে যাব!’

ছেলেটা তখনও মাটিতে পা ঠেকিয়ে সাইকেলের ভর রেখেছে। মন্দির হয়তো খুব কাছে নয়। যেতে চাইবে কি? শেষ চেষ্টা হিসেবে মতিয়ুর হঠাৎ ওয়ালেট বার করে একটা পঞ্চাশ টাকার নোট ছেলেটার দিকে এগিয়ে ধরে বলল, ‘একটু কষ্ট করে আমাকে একবার ঘুরিয়ে আনবে ভাই? এই সামান্য দক্ষিণাটুকু রাখো।’

ছেলেটি হাতের সাত সেলের টর্চ মতিয়ুরের মুখের পাশ দিয়ে বাড়িয়ে ধরে একটা মজা পুকুরের পাড়ের দিকে আলো নাচিয়ে বলল, ‘যুধিষ্ঠিরের মন্দিরে যেতে হলে আপনাকে যেতে হবে দ্রৌপদীর থানে। সেখানে তো কেউ একবার ঘুরেই ফিরে আসে না।’

‘তবু চলো ভাই। আমার পাঁচ মিনিটের কাজ। আমাকে যেতে হবে যুধিষ্ঠিরের মন্দির। দ্রৌপদীর থান যদি তার খুব কাছেই হয়, সেখানেও যাব না হয় এক মিনিটের জন্য।’

‘কাছে কি বলছেন? যুধিষ্ঠিরের মন্দিরই তো দ্রৌপদীর থান। মেয়েরা যায় দ্রৌপদীর থানে, মুখে বলে যুধিষ্ঠিরের মন্দিরে যাচ্ছি। লজ্জা ঢাকতে বলে আর কী! এটাই এখানকার দু’তিনটে গ্রামের রীতি। কেউ তো আর সাধ করে যায় না, দাদা।’

‘লজ্জা? কিসের লজ্জা? যুধিষ্ঠিরের মন্দিরই হোক, আর দ্রৌপদীর থান— ধর্মস্থানে যেতে লজ্জা হবে কেন?’

অন্ধকারে পথ হারানোর মতো এও মনের এক ধরনের দিশাহারা অবস্থা। মতিয়ুর সাইকেলের হ্যান্ডেলে রাখা ছেলেটার হাত চেপে ধরে বলল, ‘একবার ওই দ্রৌপদীর থানেই নিয়ে চলো আমাকে।’

মতিয়ুরকে পিছনে বসিয়ে সাইকেল চালাতে চালাতে সে আগের কথার জের টেনে বলে চলল, ‘অনেক কাল আগে ওখানেই যুধিষ্ঠিরের মন্দির ছিল। শুনেছি রথের মতো, পোড়ামাটির তৈরি।’

একটু পরে আবার তার কথা শোনা গেল, ‘কোনও মেয়ের খোঁজে যাচ্ছেন তো আপনি? ওই যাকে বাড়িতে পেলেন না? এরপর ট্রেন পাবেন?’

'পাঁচ মিনিটে আমার কাজ হয়ে যাবে।'

গলার স্বরেই বোঝা যায় অন্ধকারেও ফিচকে হেসে ছেলেটা বললে, 'দ্রৌপদীর থানে কি আর পাঁচ মিনিটে কাজ সারা যায়?'

টর্চের আলোয় পরখ করে পঞ্চাশ টাকার কড়কড়ে নোটটা নিয়েছে বলেই হয়তো, মতিয়ুরের সময় বাঁচাতে একটা দিশি মদের দোকানের পিছন দিয়ে শর্টকাট রাস্তা ধরল।

'দ্যাখো আমার একটা ছোট আমবাগান একজনকে দান করতে চাই। দানপত্রের দলিল আমার সঙ্গেই আছে। কয়েকটা সই করিয়ে নিলেই হবে। সাক্ষীর নামধাম আমিই ব্যবস্থা করে দিয়েছি। হবে না পাঁচ মিনিটে?'

'দেখুন চেষ্টা করে। তবে সইটই করাবার জায়গা ওটা নয়। তাছাড়া দূর দূর গাঁয়ের লোকের ভিড়ও থাকে ওখানে। শান্তিপুর লোকালেও আসে অনেকে।'

একটু থেমে আবার, 'দ্রৌপদীর ক'টা হাজব্যান্ড জানেন তো? ওখানেও সেই নিয়ম। একেকজন মেয়ের ঘরে এক সন্ধেয় দু-চারজন পুরুষের আগমন হবেই। এবার বুঝলেন তো?'

ছেলেটা জোরে জোরে প্যাডেল করে চলেছে, মুখও চলছে তেমনই— 'সব মেয়ের অতিথি আপ্যায়ন কিন্তু একরকম না। নানা বয়েসের মেয়ে তো।'

'সাইকেল ঘোরাও। স্টেশন চলো। ট্রেন ফেল হয়ে যাবে আমার!'

স্টেশন না আসা পর্যন্ত ছেলেটার কথা ফুরোয় না। স্টেশনের বাইরে থেকেই দেখা যায় ট্রেন এসে দাঁড়িয়ে আছে।

মতিয়ুর ছুটতে ছুটতে গিয়ে এক লাফে চলন্ত ট্রেনে উঠে পড়ল। এ ট্রেন না পেলে, উঃ, সে ভাবতেও পারে না, মেয়েটা সারা রাত একা কেঁদে কাটাত!

হায়! নানার আমলের আমবাগান লীনাকে দানপত্র করে দিয়ে সামনের মাসের চার তারিখে মেয়ের জন্মদিনে তাকে আনবার কথা দিয়ে এসেছে মতিয়ুর! ঠিক সাড়ে ন-বছর পর শুধু এই জন্যই তার মউঝুরিতে আসা।

এত রাতে কলকাতা যাবার শেষ ট্রেন প্রায় ফাঁকা। জানলার ধারে বসে সে কিছুক্ষণ পর পর বুক-ভাঙা দীর্ঘশ্বাস ছাড়তে লাগল। বাইরের হাওয়ার ঝাপটায় তার সব দীর্ঘশ্বাস নিমেষে উড়ে যাচ্ছে।

ট্রেন পার্ক সার্কাসের মুখে সিগন্যাল না পেয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। মনে এখন একটাই চিন্তা। বাড়ি ফিরে মেয়েকে কী বলবে? কী করে মিথ্যে বোঝাবে যে আম্মি তার স্কুলের মেয়েদের নিয়ে এক্সকারশানে গেছে। কোথায় গেছে? হাজারিবাগ। না না, হাজারদুয়ারি। না কি সুন্দরবন বা সুনতালে খোলা? কোনটা বললে মেয়ে বিশ্বাস করবে!

এত বছর পর এই প্রথম মতিয়ুর শুধু মেয়ে জুঁইয়ের কথাতেই তার জন্মদিনে লীনাকে আসবার জন্য বলতে গিয়েছিল। রাজি করানো অসম্ভব বুঝে সে তার সাধের আমবাগান দানের কাগজপত্র নিয়েই বেরিয়েছিল। তেমন দরকার বুঝলে ওই ঘুষটুকু দেবে।

বাড়ি ফিরে মেয়ের সঙ্গে থেকেও সারা দিন কেন যে তার মনে থেকে থেকেই কাঁটা

ফুটতে লাগল সে হয়তো নিজেও জানে না। কতকালের একান্ত আপন এক নারী শেষ পর্যন্ত এমন হীন মনে দ্রৌপদীতে রূপান্তরিত হল!

পরদিন রাতে না ঘুমনো পর্যন্ত মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে হঠাৎই তার মনে হল, তাদের মতো তার মেয়েরও নিশ্চয়ই ভালোবেসে শাদি হবে। তাদের মতো তারও ডিভোর্স হতে পারে তো? তারপর? মেয়ে তার লেখাপড়ায় খুবই সাধারণ। চাকরির বাজার দিন দিন আরও খারাপ। তেমন পরিস্থিতিতে কী করবে তার আদরের জুঁইফুল?

জন্মদিনে মেয়ের বন্ধুদের সঙ্গে তাকে মেতে থাকতে দেখেও তার চন্দন আঁকা মুখখানার দিকে যতবার চোখ পড়ে তার মন ততই অস্থির হয়ে ওঠে!

এরপর মাঝে মাঝেই মতিয়ুর হঠাৎ অফিস থেকে সোজা মেয়ের স্কুলে গিয়ে খোঁজ নেয়— তার কোনও বিপদ হয়নি তো!

ক্রমশ মতিয়ুরের কথা কমতে কমতে প্রায় বন্ধই হয়ে গেল। মাঝে মাঝে ছোটবেলার পড়া মুখস্ত করার মতো দুলে দুলে বলতেই থাকে— যুধিষ্ঠিরের মন্দির। দৌপদীর থান। মহাভারতের কথা অমৃতসমান।

পাগলামির লক্ষণ ক্রমবর্ধমান।

জুঁইয়ের পরের জন্মদিনের দিন অতিষ্ঠ প্রতিবেশীদের ব্যবস্থাপনায় উন্মাদ-আশ্রমের লোকেরা তাকে জোর করে হাত-পা বেঁধে গাড়িতে তুলে নিয়ে গেল। গাড়িতে বসে মতিয়ুর হঠাৎ শান্ত স্বরে বলল, 'দ্রৌপদীর থানে যাব।'

প্রথম প্রকাশ: *আজকাল, ১৪ মে, ২০১৭*